প্রবন্ধ

তরুণের বিদ্রোহ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

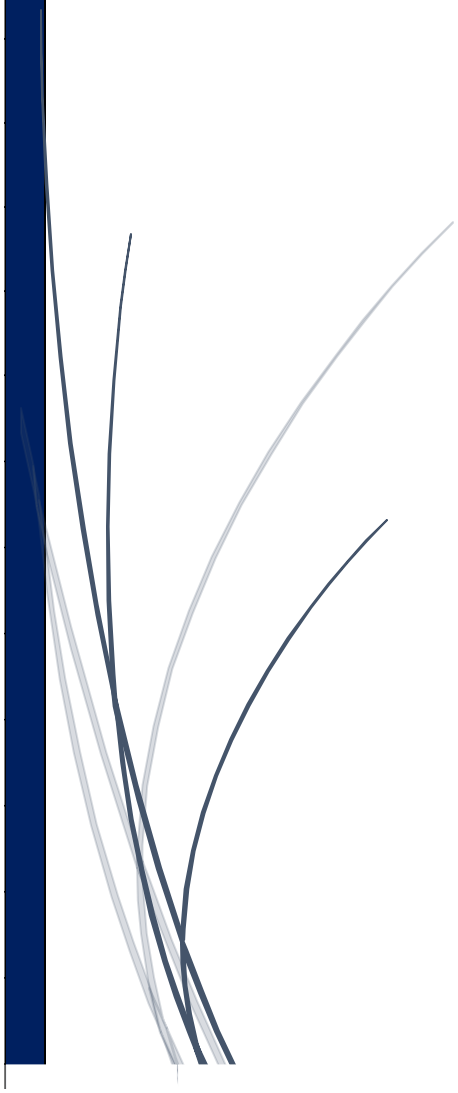

BENGALIEBOOK.COM
2021

তরুণের বিদ্রোহ

বন্ধুগণ,

নিজের জীবন এলো যখন সমাপ্তির দিকে, তখন ডাক পড়লো আমার দেশের এই যৌবন-শক্তিকে সম্বোধন ক' রে তাদের যাত্রাপথের সন্ধান দিতে। নিজের মধ্যে কর্মশক্তি যখন নিঃশেষিতপ্রায়, উদ্যম ক্লান্ত, প্রেরণা ক্ষীণ, তখন তরুণের অপরিমেয় প্রাণধারার দিক-নির্ণয়ের ভার পড়লো এক বৃদ্ধের উপর। এ আহ্বানে সাড়া দিবার শক্তি-সামর্থ্য নেই—সময় গেছে। এ আহানে বুকের মধ্যে শুধু বেদনার সঞ্চার করে। মনে হয়, একদিন আমারও সবই ছিল—যৌবন, শক্তি, স্বাস্থ্য, সকলের কাজে আপনাকে মিশিয়ে দেবার আনন্দবোধ—এই যুব—সংঘের প্রত্যেকটি ছেলের মতই,—কিন্তু সে বহুদিন পূর্বেকার কথা। সেদিন জীবন-গ্রন্থের যে-সকল অধ্যায় ঔদাস্য ও অবহেলায় পড়িনি, এই প্রত্যাসন্ন পরীক্ষার কালে তার নিষ্ফলতার সান্ত্বনা আজ কোন দিকেই চেয়ে আমার চোখে পড়ে না। আমি জানি, এই তরুণ-সংঘকে জোর ক'রে বলবার কোন সঞ্চয়ই আমার নেই। তাদের পথ-নির্দেশের গুরুতর দায়িত্ব আমার সাজে না; সে কল্পনাও আমি করিনে। আমি কেবল গুটি-কয়েক বহুপরিচিত পুরাতন কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি।

পেশা আমার সাহিত্য; রাজনীতি-চর্চা হয়ত আমার অনধিকার চর্চা, এ কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আরও একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, সে আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে। আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন দিন কোন ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর ক'রে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি

পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবন-সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; বর্তমান কালে কোন্ পরিবর্তন উপযোগী, এবং কোন্‌টার সময় আজও আসেনি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে রেখেই নিশ্চিন্তমনে বিদায় নিয়েছি; আজকে এই কয় ছত্র লেখার মধ্যেও তার অন্যথা করিনি। এখানেও সেই সমস্যা আছে, তার জবাব নেই। কারণ জবাব দেবার ভার বাঙ্গালার তরুণ-সংঘের—এ বৃদ্ধের নয়। সেইটাই এই অভিভাষণের বড় কথা।

প্রথমেই একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া চাই। তরুণ-সংঘ যে রাষ্ট্রিক সংস্রবে অংশতঃ বিজড়িত, এ সত্য গোপন ক'রে লাভ নেই। এ তার কর্তব্য। অথচ এই শহরে দিন-দুই পরে বাঙ্গালা দেশের রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের কাজ আরম্ভ হবে। সুতরাং উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যখন বহুলাংশে এক, তখন আলাদা করে তরুণ-সংঘ সম্মিলনের কি আবশ্যকতা ছিল ? কেউ কেউ বলেন আবশ্যকতা এই জন্যে যে,তরুন-সংঘের মধ্যে অনেক ছাত্র আছেন এবং ছাত্র না হয়েও এমন অনেক আছেন, যাঁরা খোলাখুলিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন না। বাধা ও নিষেধ বহুপ্রকার আছে, তাদের জন্য একটা আবরণ দরকার। কিন্তু আবরণ দিয়ে—কৌশলে ও ছলনার আশ্রয়ে, কোন দিন সত্যকার সিদ্ধিলাভ হয় না। কাজ করতেও চাই, উপরওয়ালার চোখেও ধুলো দিতে চাই—এ দুটো চাওয়া একসঙ্গে পাওয়া যায় না, অতএব যুব-সংঘকে স্পষ্ট করে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশের কাছে ব্যক্ত করতে হবে। ভয় করলে চলবে না। কিন্তু তা যারা পারে না, তাদের দিয়ে এটাও হবে না,—সেটাও নিষ্ফল হবে।

কিন্তু আসলে তা নয়। এ দুটো প্রতিষ্ঠানের বাইরের চেহারায় হয়ত অনেক সাদৃশ্য আছে কিন্তু ভিতরের দিক্ থেকে দেখলে দেখা যাবে প্রভেদও অপরিসীম। কংগ্রেস অনেক দিনের—আমারই মত সে বৃদ্ধ; কিন্তু যুব সংঘ সেদিনের—তার শিরার রক্ত এখনও উষ্ণ, এখনও নির্মল। কংগ্রেস দেশের মাথাওয়ালা আইনজ্ঞ রাজনীতি- বিশারদগণের আশ্রয়কেন্দ্র কিন্তু যুব-সংঘ কেবলমাত্র প্রাণের ঐকান্তিক আবেগ ও আগ্রহ দিয়ে তৈরী। একটাকে চালনা করে কূটবিষয়বুদ্ধি, কিন্তু অন্যটাকে নিয়োজিত করে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম; তাই নানা প্ররোচনা ও উত্তেজনার পর মাদ্রাজ-কংগ্রেস যখন পাস করেছিল দেশের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, তখন সে বস্তু টেঁকলো না—একটা বৎসর গত না হতেই কলিকাতার কংগ্রেসে সে মত নাকচ হয়ে গেল। স্বাধীনতার পরিবর্তে তাঁরা ফিরে চাইলেন Diminion Status; কিন্তু দেশের তরুণদল সে নির্ধারণে কান দিল না। উভয় প্রতিষ্ঠানের এইখানেই পার্থক্য। পুরাতনের বিধি-নিষেধের বেড়াজালে প্রাণ তার হাঁপিয়ে উঠে, যুব-সমিতির জন্ম-ইতিহাসের এই হেতু। শুধুই কি কেবল ভারতবর্ষে? পৃথিবীর যে-কোন দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই যেন এর নব অভ্যুদয়ের রক্তরাগ-রেখা চোখে পড়ে। দেখা যায়, কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্বপ্রকার নীতির সম্পর্কেই তরুণ-শক্তি যেন নবচেতনা লাভ করেছে। তাঁরা ছাড়া জগতের বর্তমান দুর্ভেদ্য সমস্যা যে কোন মতেই মীমাংসিত হবে না, এ সত্য তারা নিঃসংশয়ে অনুভব করেছে। এটা মস্তবড় আশার কথা। পুরাতনপন্থীরা তাদের মাঝে মাঝে তিরস্কার করে বলেন, তোমরা সেদিনের—তোমাদের কতটুকু অভিজ্ঞতা? যুব-সমিতি এ অভিযোগের উত্তর দিতে ছাড়ে না।

কিন্তু আমি ভাবি, নানা বাগ্‌বিতণ্ডার মাঝে এ-কথা কেন না তারা স্পষ্ট করে জানায় যে পুরাতনের অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধেই তাদের সবচেয়ে বড় লড়াই? তাদের এই বহুযত্ন-অর্জিত ঘনবিন্যস্ত অভিজ্ঞতার জ্ঞানটাকেই নিঃশেষে দগ্ধ করে দিয়ে তারা জগতকে মুক্তি দিতে চায়। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বস্তুতঃ এই-ই দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান—যা বিদেশীর রাজশাসনের অবিচার ও অনাচার মুখ বুজে মেনে নেয়নি। তার দীর্ঘকালব্যাপী বাদ-প্রতিবাদ অনুযোগ-অভিযোগের

সম্মিলিত কোলাহল বধির রাজকর্ণে প্রবেশ করেনি সত্য কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল কি ? এমনিভাবে দিন চলে যাচ্ছিল, সহসা একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ-অসহযোগ এবং তার টিকি বাঁধা রইলো তার খাদি-চরকার দড়িতে। স্বরাজের তারিখ ধার্য হলো ৩১শে ডিসেম্বর। এলো জেলে যাবার দিন, এলো আত্মত্যাগের বন্যা। মন্ত্র এলো বাঙ্গালার বাইরে থেকে, অথচ যত চরকা ও যত খাদি সেদিন বাঙ্গালায় তৈরী হলো, যত লোক গেল বাঙ্গালার কারাগারে, যত ছেলে দিলে জীবনের সর্বস্ব বলিদান, সমগ্র ভারতবর্ষে তার জোড়া রইল না। কেন জান? কারণ এই বাঙ্গালার ছেলে যতখানি তার দেশকে ভালবাসে, হয়ত পাঞ্জাব ছাড়া তার একাংশও ভারতের কোথাও খুঁজে মিলবে না। তাই 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্র সৃষ্টি এই বাঙ্গালায়। এই বাঙ্গালাতে জন্ম নিয়েছিলেন পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় দেশবন্ধু। এদিকে ৩১শে ডিসেম্বর পার হয়ে গেল—স্বরাজ এলো না। কোথায় কোন্ এক অজানা পল্লী চৌরীচৌরায় হলো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ করে। দেশের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত একমুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন একজন জীবিত ছিলেন, তাঁর ভয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল না—তিনি দেশবন্ধু। তিনি তখন জেলের মধ্যে; বাঙ্গালার বাহির-ভিতরের সকলে মিলে দিলে তাঁর সমস্ত চেষ্টা-আয়োজন নিষ্ফল করে। কে জানে, ভারতের ভাগ্য হয়ত এতদিনে আর এক পথে প্রবাহিত হতে পারতো, কিন্তু যাক সে কথা।

আবার কিছুদিন নিঃশব্দে থাকার পরে সাড়া পড়ে গেছে। সেবার ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, এবার হয়েছে সাইমন কমিশন। আবার সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জন, সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়ার প্রস্তাব, সেই ৩১শে ডিসেম্বর, এবং সর্বোপরি বাঙ্গালার বাইরের নেতার দল আবারও বাঙ্গালার ঘাড়ে চেপে বসেছে। আমি জানি এবারও সেই ৩১শে ডিসেম্বর ঠিক তেমনি করে পার হয়ে যাবে। কেবল একটুখানি ক্ষীণ আশার আলো বাঙ্গালার এই যৌবনশক্তির জাগরণ। বঙ্গভঙ্গ সেটেল্‌ড্ ফ্যাক্ট (settled fact) একদিন আন্‌সেটেল্‌ড্ (unsettled) হয়েছিল—সে এই বাঙ্গালাদেশে। সেদিন বাইরে থেকে কেউ ভার বইতে আসেনি, আন্দোলন পরিচালনার

পরামর্শ দিতে বাইরে থেকে কর্তা আমদানি করতে হয়নি; বাঙ্গালার সমস্ত দায়িত্ব সেদিন বাঙ্গালার নেতাদের হাতে ন্যস্ত ছিল।

প্রত্যেক দেশেরই স্বভাব, প্রবৃত্তি, রীতিনীতি, চালচলন বিভিন্ন। এ বিভেদ শুধু তার দেশের লোকেই জানে। এই জানার উপর যে কতবড় সাফল্য নির্ভর করে, বহু লোকেই তা ভেবে দেখে না। অবশেষে এই অজ্ঞতাই একদিন যখন বিফলতার গর্তে টেনে ফেলে তখন দেশের লোকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে বাইরের মানুষে সান্ত্বনালাভ করে। ভাবে সমস্ত দেশের কার্য- তালিকা সর্বাংশে এক হওয়ার নামই বুঝি একতা। বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মধ্যেও যে সত্যকার ঐক্য নিহিত থাকতে পারে, এই সত্য স্বীকৃত হয় না বলেই গণ্ডগোল বাধে। তাই ত দেশের লোকের হাতেই তার আপনার দেশের কাজের ধারা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। সাইমন সাহেবের দলেরও ঠিক এই ভুলই হয়েছিল, যখন এক দেশ থেকে এসে তাঁরা আর এক দেশের constitution তৈরির স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলেন—এই কথাটা বাঙ্গালার যুব সমিতিকে ভেবে দেখতে আজ আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

আমার বক্তব্য নীরস, অনেকের কানে হয়ত কটু শোনাবে; শব্দাড়ম্বরের ঘটায় বচন-বিন্যাসের কৌশলে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে আমি অক্ষম। কিন্তু তোমরা ত জান, সোজা কথা সোজাভাবে বলাই আমার স্বভাব। কারও বিরুদ্ধে কতগুলো কঠোর অভিযোগ করতেও আমি নারাজ, তাই আমার কথার মধ্যে তেমন স্বাদ নেই—এ আমি নিজেই অনুভব করি। কিন্তু ভরসা এই যে, রাষ্ট্রীয় সম্মিলন আসন্নপ্রায়। নেতারা অনেকে এসে পড়েছেন; বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরাও এলেন বলে। বক্তৃতা শুনে তোমাদের ক্ষুধা মিটবে। ইংরাজ-রাজত্বের দেড় শো বছরের ইতিহাস তাঁদের কণ্ঠস্থ। ইংরেজ, তুমি এই করেছ—এই করেছ—এই করেছ, এই করনি—এই করনি —এই করনি,—অমুককে লাঠি মেরে খুন করছ,—অমুককে বিনাবিচারে আটক করেছ,—চা-বাগানের অমুক সাহেবকে ছেড়ে দিয়েছ,—অতএব তোমার রাজ্য শয়তানের। এমনি অত্যাচারের ধারাবাহিক ফর্দ দিয়ে জগতের কাছে তাঁদের নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করতে হয় যে, ইংরেজ-শাসনপ্রণালী অতিশয় মন্দ এবং তার চাপে আমরা আর বাঁচিনে। সুতরাং হয় আইনকানুন বদলাক, নয় এর

সঙ্গে আমরা আর কোন সংস্রব রাখব না। এ-সকলের যে প্রয়োজন নেই তা আমি বলিনে, বরঞ্চ বোধ করি বেশী প্রয়োজনই আছে। কিন্তু প্রয়োজন যতই থাক, এইখানেই উভয় প্রতিষ্ঠানের মনস্তত্ত্বের গভীর ব্যবধান। কারণ শয়তানের রাজ্য কিনা—এ সপ্রমাণ করার দায়িত্ব যুব-সমিতির নেই। তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা এই উত্তরই দেবে যে, বিদেশীর শাসনপ্রণালী যা হয় তাই। কংগ্রেসের সম্মিলিত ধিক্কারে লজ্জিত হয়ে তারা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবে কি না, সে তারাই জানে, কিন্তু আমরা জানি তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। স্বাধীনতার বিনিময়ে পরাধীন স্বর্গরাজ্যও দেশের যৌবনশক্তি কোনদিন প্রার্থনা করবে না।

কিন্তু স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নামমাত্রই ত নয়! দাতার দক্ষিণহস্তের দানেই ত একে ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না,—এর মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কোথায় মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত। সে অর্গল যতদিন না মুক্ত হবে, কোথাও এর সন্ধান মিলবে না। সেই অর্গল মুক্ত করার দিন এসেছে। কোনক্রমেই আর বিলম্ব করা চলে না। কি মানুষের জীবনে, কি দেশের জীবনে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ যখন শূন্য দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে, তখন কিছু না জেনেও যেন জানা যায় সর্বনাশ অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র পল্লীর অতিক্ষুদ্র নরনারীর মুখের পরেও আমি তার আভাস দেখতে পাই। চারিদিকে দুর্বিষহ অভাবের মধ্যে কেমন করে যেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়েছে—এদেশে এ থেকে আর নিষ্কৃতি নেই, দুর্নিবার মরণ তাদের গ্রাস করলে বলে।

এদের বাঁচাবার ভার তোমাদের। এ ভার কি তোমরা নেবে না? জগতের দিকে দিকে চেয়ে দেখ—এ বোঝা কে বয়েছে। তোমরাই ত! শুধু এদেশেই কি তার ব্যতিক্রম হবে? শান্তি-স্বস্তিহীন সম্মানবর্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এতবড় লোভের বস্তু? দেশকে কি বাঁচায় বুড়োরা? ইতিহাস পড়ে দেখ। তরুণ-শক্তি নিজের মৃত্যু দিয়ে দেশে দেশে কালে কালে জন্মভূমিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে গেছে। এ সত্ত্বেও যদি তোমরা ভোলো, তবে এ সমিতি গঠনের তোমাদের লেশমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়—সে বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলো না যে, কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফললাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্যে তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়। যারা মনে করে, জগতে আর সব-কিছুরই আয়োজনের প্রয়োজন, শুধু বিপ্লবেরই কিছু চাই না—ওটা শুরু করে দিলেই চলে যায়, তারা আর যত-কিছুই জানুক, বিপ্লব-তত্ত্বের কোন সংবাদ জানে না। মনে মনে যাঁরা বিপ্লবপন্থী, আমার কথায় হয়ত তাঁরা খুশী হবেন না। কিন্তু আমি গোড়ায় বলে রেখেছি, খুশী করার জন্য এখানে আসি নাই। এসেছি সত্য কথা সোজা করে বলবার জন্যে।

আমরা কতদিকেই না নিরুপায়! অনেকে বলেন, বিদেশী রাজশক্তি আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে একেবারে অমানুষ করে রেখেছে। অভিযোগ যে অসত্য তা আমি বলিনে, কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? অস্ত্রশস্ত্র আজই না হয় নেই, কিন্তু হাজার বছর ধরে করেছিলাম কি? তখন ত Arms Act জারি হয়নি! সবচেয়ে বেশী নিরুপায় করেছে—আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আত্মকলহ। তাই বার বার মোগল-পাঠান-ইংরাজের পায়ে আমাদের মাথা মুড়ানো গেছে। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিমান জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আত্মকলহ তাদের মধ্যে থাকে না যে তা নয়, কিন্তু বহিঃশত্রুর সম্মুখে সে কলহ তারা স্থগিত রাখতে জানে। শত্রুকে সম্পূর্ণ পরাভূত না করা পর্যন্ত তারা কিছুতেই ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত হয় না। এই তাদের সবচেয়ে বড় জোর। কিন্তু আমাদের? জয়চাঁদ, পৃথ্বিরাজ থেকে শুরু করে সিরাজদ্দৌলা ও মীরজাফরেও এই মজ্জাগত অভিশাপ আর ঘুচল না।

বাঙ্গালাদেশ মুসলমানেরা জয় করতে এলো। এদেশে ব্রাত্য-বৌদ্ধেরা খুশী হয়ে তাদের ধর্মদেবতার যশোগান করে 'ধর্মমঙ্গলে' লিখলেন –

"ধর্ম্ম হইলা যবনরূপী
মাথায় দিলা কালোটুপী
ধর্ম্মের শত্রু করিতে বিনাশ।"

অর্থাৎ বিদেশী মুসলমানরা যে হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রতিবেশী বাঙ্গালী ভায়াদের দুঃখ দিতে লাগল, এতেই তাঁরা পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। এই ত সেদিনের কথা—নিজেদের মধ্যে লড়াই করতেই অতবড় বিরাট্‌পুরুষ চিত্তরঞ্জনের সমস্ত আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেল। আজও কি তার বিরাম আছে? এই যে যুব-সংঘ, খোঁজ করলেই দেখা যাবে এর মধ্যেও তেরটা দল। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই—এর কতরকমের মতভেদ, কতরকমের মান-অভিমানের অ-বনিবনাও— পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত অস্থির, কখন গড়িয়ে আলাদা হয়ে গেল বলে। বাইরে থেকে জড়ো করে ভিড় করার নাম কি organisation? Organic দেহবস্তুর মত এর পায়ের নখে ঘা দিলে কি মাথার চুল শিউরে ওঠে? কিন্তু যেদিন উঠবে, সেদিন উপায়হীনতার নালিশও অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশে উঠবে না।

ভাবি, সেই ত সনাতন সংস্কার! শত্রু এসে সদর দরজায় ঘা দিচ্ছে, তবু দলাদলি আর মিটল না! অথচ এদের পরেই দেশের আজ সমস্ত আশা-ভরসা! কবে যে এর মীমাংসা হবে, তা জগদীশ্বরই জানেন।

আগেকার দিনে দিগ্বিজয়ের গৌরব অর্জন করার জন্যে প্রধানতঃ রাজারা রাজ্যজয়ে বার হতেন, কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে। এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। এবং সেই শক্তি আছে জন-কয়েক বড় ব্যবসাদারের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিক্-বৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি। শোষণের জন্যেই শাসন। নইলে তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। দশ-পনের বছর পূর্বে যে জগৎ-ব্যাপী সংগ্রাম

হয়ে গেল, তার গোড়াতেও ছিল ঐ এক কথা—ঐ বাজার ও খদ্দের নিয়ে দোকানদারের কাড়াকাড়ি।

বস্তুতঃ এইখানে আঘাত দেওয়ার মত বড় আঘাত বর্তমানকালে আর নেই। নানা অসম্মানে ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ-পণ্য বর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে; সঙ্কল্প তাদের সিদ্ধ হোক। বাঙ্গালার তরুণের দল, এই সংঘর্ষে তোমরা তাদের সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করো। কিন্তু অন্ধের মত নয়; মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়; কংগ্রেস সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করে বেড়ালেও নয়। ভারতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে আশি ক্রোর টাকার অভাব পূর্ণ করা যায় না। কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না, এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না। বিশেষতঃ সম্প্রতি এটা অর্থনৈতিক বিবাদ নয়, রাজনৈতিক বিবাদ। এ কথা কোনমতেই ভোলা উচিত নয়। সুতরাং জাপানী সূতায় দেশের তাঁতের কাপড় দিয়ে হোক, দেশের কলকব্জার তৈরী কাপড় দিয়ে অথবা খেয়ালী লোকের খদ্দর দিয়েই হোক, এ ব্রত উদ্‌যাপন করাই চাই। বাঙ্গালাদেশে এই ব্রত অজানা নয়। সেদিন যে পথ বাঙ্গালার মনীষীরা স্থির করে দিয়েছিলেন, আজও সেই পথেই এই সঙ্কল্প সার্থক হবে। British cloth—এর স্থানে foreign cloth জুড়ে দিয়ে অহিংসা-নীতির পরাকাষ্ঠা দেখানো যেতে পারে, কিন্তু অসম্ভবের মোহে, আত্মবঞ্চনায় শুধু বঞ্চনার জঞ্জালই স্তূপাকার হবে—আর কিছুই হবে না। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের ভোজবাজি সেবারের মতনই চোখে ধুলো দিয়ে নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

বাঙ্গালার পল্লীতে আমার গৃহ; বাঙ্গালাকে আমি চিনিনে এ অপবাদ বোধ করি আমার অতিবড় শত্রুও আমাকে দেবে না। ঘরে ঘরে গিয়ে দেখেছি, এ জিনিস চলে না। স্বদেশবৎসল দুই-চারজন পুরুষের যদি-বা চলে, মেয়েদের চলে না। অন্যান্য প্রদেশের কথা জানিনে, কিন্তু এ দেশের তাদের দিনান্তে অনেকগুলি বস্ত্রের প্রয়োজন। এই এ দেশের সামাজিক রীতি এবং এই এ দেশের মজ্জাগত সংস্কার। সভায় দাঁড়িয়ে খদ্দরের মহিমায় গলা ফাটালেও সে চীৎকার গিয়ে কোনোমতেই পল্লীর নিভৃত অন্তঃপুরে পৌঁছবে না। সচ্ছল গৃহস্থের কথাই শুধু বলিনে, গরীব চাষাভুষোর ঘরের কথাও আমি বলছি,— এই

সত্য, এবং একে স্বীকার করাই ভাল। বাঙ্গালার কোনো একটা বিশেষ সবডিভিসনে মণ-দুই চরকায়-কাটা সুতো তৈরী হওয়ার নজীর দাখিল করে এর জবাব দেওয়া যাবে না। এই তো গেল খদ্দরের বিবরণ। চরকারও ঐ অবস্থা। আমাদের ওদিকে চাষাভুষো দরিদ্র ঘরে মেয়েদের উদয়াস্ত খাটুনি। তারই ফাঁকে এক-আধ ঘন্টা যদি সময় পায়, মহাত্মার আদেশ জানিয়ে চরকার হাতল হাতে তার গুঁজে দিলেও ঘুমিয়ে পড়ে। দোষ দিতে পারিনে। বোধ হয় সত্যিকার প্রয়োজন নেই বলেই এমনি ঘটে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত,—মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন নিত্যই কমিয়ে আনা দরকার। অভাব-বোধই দুঃখ।

অতএব দশ হাতের বদলে পাঁচ হাত কাপড় এবং পাঁচ হাতের বদলে কৌপীন পরিধান—এবং যেহেতু বিলাসিতা পাপ, সেই হেতু সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনই মনুষ্যত্ব-বিকাশের সর্বোত্তম উপায়। এই পুণ্যভূমি ত্যাগ-মাহাত্ম্যেই ভরপুর। উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, এই ত্যাগের মন্ত্র দিনের পর দিন সর্বসাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে নামিয়ে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা করবে কি, অভাব-বোধটাই তাদের শুকিয়ে গেছে। ছোট জাত অস্পৃশ্য—তাতে কি ? ভগবান করেছেন! একবেলার বেশী অন্ন জোটে না,— কপালের লেখা! এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যারা আর একটু বেশী জানে, তারা উদাস চক্ষে চেয়ে বলে, সংসার ত মায়া,—দু'দিনের খেলা; এ-জন্মে সন্তুষ্টচিত্তে দুঃখ সয়ে গেলে আর-জন্মে মুখ তুলে চাবেন। এক অদৃষ্ট ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে তাদের নালিশ নেই। চাইতে তারা জানে না, চাইতে তারা ভয় পায়। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, অভাবের পরে অভাব নিরন্তর যতই চেপে বসে, ততই তারা সহ্য করার বর প্রার্থনা করে। তাতেও যখন কুলোয় না, তখন আকাশের পানে চেয়ে নিঃশব্দে চোখ বোজে।

একটা কথা পুরানো-পন্থীদের মুখে দুঃখ করে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, সেকালে এমনটি ছিল না। এখন চাষারা পর্যন্ত জামা পরে, পায়ে জুতো দিতে চায়, মাথায় ছাতা

ধরে, তাদের মেয়েরা গায়ে সাবান মাখে, বাবুয়ানিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। প্রত্যুত্তরে তাদের এই কথাই তোমাদের বলা চাই যে, এই যদি সত্য হয় ত আনন্দের কথা। দেশ উচ্ছন্ন না গিয়ে উন্নতির দিকে মুখ ফিরিয়েছে, তারই আভাস দেখা দিয়েছে। মানুষ যত চায়, ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা – তাকে স্বীকার করে তার গোলামি করাটাই কাপুরুষতা। একদিন যা ছিল না, তাকে অহেতুক বাবুয়ানি বলে ধিক্কার দিয়ে বেড়ানোই দেশের কল্যাণ কামনা নয়।

বিগত ডিসেম্বরে কলকাতায় আহূত All India Youth League-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নরিম্যান সাহেবের বক্তৃতার একটা স্থান আমি উল্লেখ করতে চাই। তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে বার বার এই কথাটা বলেছিলেন যে বারদোলীতে ইংরেজ-শাসনদণ্ডকে আমরা ভূমিসাৎ করে দিয়েছি! ব্রিটিশসিংহ লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারছে না। এতএব Bardolise the whole Country। বারদোলীর গৌরবহানি করবার সংকল্প আমার নেই, এবং ওরা যে সাহসী এবং দৃঢ়চিত্ত এবং বড় কাজই করেছে তা সম্পূর্ণ স্বীকার করি। কিন্তু ঠিক এমনি কাজ যদি কখনও তোমাদের বাঙ্গালার করতে হয় ত কোরো, কিন্তু পশ্চিম ভারতের কংগ্রেস নেতাদের মত পৃথিবীময় অমন তাল ঠুকে ঠুকে বেড়িয়ো না। একটুখানি বিনয় ভালো। ব্যাপারটা কি হয়েছিল সংক্ষেপে বলি। প্রজারা বললে, "হুজুর, এক টাকার খাজনা দু'টাকা হয়ে গেছে, আমরা আর দিতে পারব না– মারা যাব। সত্য কিনা খোঁজ করুন।" অবিবেচক রাজকর্মচারী বললে, "না, সে হবে না।

আগে খাজনা দাও, তারপরে অনুসন্ধান করব।" প্রজারা বললে, "না।" নেতারা জমা হয়ে সরকারকে জানালেন, এটা নিছক অর্থনৈতিক বিবাদ–একেবারেই রাজনৈতিক নয়। গভর্নমেন্ট কান দিলে না, অল্পস্বল্প অত্যাচারেই উৎপীড়ন শুরু হল–কতকটা যেমন ইউনিয়ন বোর্ড উপলক্ষে মেদিনীপুরে সেবারে হয়েছিল। ছোট-বড় যেখানে যত নেতা ছিলেন, রৈ রৈ শব্দ করতে লাগলেন; খবরের কাগজগুলোর একটা মোচ্ছোপ লেগে গেল। লাখে লাখে টাকা গিয়ে পড়ল বারদোলীতে,–যুদ্ধ চলতে লাগল। যুদ্ধ ততদিন থামল না, যতদিন না সরকারের সন্দেহ দূর হল যে, প্রজারা সত্যই ব্রিটিশ রাজত্ব উলটে দিতে চায়

না,—তারা চায় শুধু একটু Inquiry এবং সম্ভবপর হয়ত কিছু খাজনার মাপ, শুধু একটা ন্যায়বিচার। মোটামুটি এই এর ইতিহাস। বাঙ্গালাদেশে একে কখনও ব্রিটিশের হার বলে ভেবো না, কিংবা political সংঘর্ষকে economical ঝগড়া বলেও কখনো ভুল করো না,—সে repression-এর চেহারাই আলাদা। কাজে যদি কখনো নামো, যেমন নেমেছিলে বিগত কংগ্রেস Volunteer Organisation-এ-যার সমতুল্য ভারতের কোথাও আজও হয়নি,—তখন আত্ম-বঞ্চনায় নিজেকে এবং দেশকে ঠকিয়ো না। তবে, ভরসা এই যে, এখানে উপস্থিত সভ্যদের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ অনেকে আছেন যাঁরা ইংরেজের সে মূর্তিকে ভালো করেই চেনেন। যার যা যথার্থ মূল্য, তা জানাবার জন্যই আমার এত কথা বলা। অসম্মানের লেশমাত্রও উদ্দেশ্য নেই।

অনেক সময় নিলাম। অভিভাষণটা হয়তো অযথা দীর্ঘ হয়ে গেল। পরিশেষে একটা কথা বলে শেষ করব—সে, দেশে শিক্ষা—বিস্তারের কথা। যে শিক্ষা সভ্যজগতের প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষা-বিস্তার গভর্নমেন্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হয় না। করতে মানা আমি করিনে, কিন্তু এখানে একটা night school, আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ খুলে যা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর। তা সে যাই হোক, লেখাপড়া ছাড়া তার অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এ কথা যাঁরা বলেন যে, দেশের সবাই লেখাপড়া না শেখা পর্যন্ত আর গতি নেই, মুক্তির দ্বার আমাদের একান্ত অবরুদ্ধ, এবং এইজন্যে সকল কর্ম পরিত্যাগ করে লেখাপড়া শেখান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তাঁরা ভাল লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের পরে আমার ভরসা কম। এইবার শেষ করি। মুসলমান ভাইদের সম্বন্ধে আলাদা করে কিছুই বলার আবশ্যক মনে করিনি—কেননা, তাঁরাও দেশের এই তরুণ-সংঘের অন্তর্গত। তরুণেরা তরুণ—জাতি—তাদের আর কোনো নাম নেই।

তোমরা ভালবেসে এতদূর আমাকে টেনে এনেছ, তার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ দিই।

সত্য মনে করে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি। পুরস্কার তার তোলা রইল। এই কংগ্রেসমণ্ডপেই দু'দিন পরে তিরস্কারের বান ডেকে যাবে। কিন্তু তখন আমি হাবড়ার

নিভৃত পল্লী মাজুতে গিয়ে সাহিত্যের দরবারে ভিড়ে যাব, এখানকার তর্জনগর্জন কানে পৌঁছবে না—এইটকুই ভরসা। *

*১৯২৯ সালের ঈস্টারের ছুটিতে, রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্বে, বঙ্গীয় যুব – সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।